যুদ্ধ হলো (শত্রুকে) ধোঁকা দেয়া

মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সকলেই যুদ্ধের দুইটি নীতির ব্যাপারে একমত- 'গোপনীয়তা' এবং 'ধোঁকা বা প্রতারণা'; তবে এক্ষেত্রে ব্যাখ্যার কিছু ভিন্নতা থাকতে পারে। তবে মু'মিনদের ক্ষেত্রে যুদ্ধের চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েজ নয়, যা কাফিররা করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যুদ্ধ হলো ধোঁকা দেয়া"। এর দ্বারা উদ্দেশ্যকে- 'যুদ্ধ...' ; বিধেয়- 'ধোঁকা...' দ্বারা নির্দিষ্টতা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধেরঅন্যতমকৌশলওএরভিত্তিহলোধোঁকা; এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ হাদীসের মতো যেখানে তিনি বলেছেন- "হাজ্জ হলো আরাফাহ"। অর্থাৎ হাজ্জেরসবচেয়েগুরুত্বপূর্ণআহকামহলোআরাফাহ, যদিও হাজ্জের আরো অনেক আহকাম রয়েছে। একই রকম বর্ণনার আরেকটি হাদীস হলোঃ "দ্বীন হচ্ছে নাসীহাত (একে অন্যের মঙ্গল কামনা করা)"।

আন নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যুদ্ধে কাফিরদের ধোঁকা দেয়া এবং ধোকার যেকোন পন্থা ব্যবহার করার ব্যাপারে আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন; যতক্ষণ না এর দ্বারা কোন চুক্তি বা নিরাপত্তার আশ্বাস ভঙ্গ হয়। সেক্ষেত্রে (চুক্তিভঙ্গ) এটি জায়েজ হবে না।"

এবং ইবনে হাযার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “আর এই ধোঁকার ভিত্তি হলো কোন একটি জিনিষ দেখিয়ে তার বিপরীতটি গোপন করা। এবং এর মাঝে যুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের উৎসাহওধোঁকাদেয়ারপরামর্শরয়েছে; আর যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে সচেতন থাকবে না, তাহলে এই বিষয়টিই তার উপর চেপে বসবে (কাফিররা এই কৌশল অবলম্বন করবে)। ইমাম আন নববী বলেছেনঃ ‘যুদ্ধে কাফিরদের ধোঁকা দেয়া এবং ধোকার যেকোন পন্থা ব্যবহার করার ব্যাপারে আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন; যতক্ষণ না এর দ্বারা কোন চুক্তি বা নিরাপত্তার আশ্বাস ভঙ্গ হয়। সেক্ষেত্রে (চুক্তিভঙ্গ) এটি জায়েজ হবে না।’ ইবনুল আরাবী বলেছেনঃ ‘যুদ্ধে ধোঁকা দেয়া হয় (শত্রুর) দুর্বলতা প্রকাশ করা, ফাঁদ পাতা এবং এমনই কিছু কৌশল বাস্তবায়নের জন্য। আর এই হাদীসে এটি (ধোঁকা) ব্যবহারের ইঙ্গিত রয়েছে; সেই সাথে এর প্রয়োজনীয়তাকে সাহসিকতার চাইতে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর একারণেই হাদীসটিতে এই বিষয়ের উপর নির্দিষ্টতা আরোপ করা হয়েছে। এটা ঐ হাদীসটির মতঃ ‘হাজ্জ হলো আরাফাহ’।’ ইবনুল মুনির বলেন, ‘ ‘যুদ্ধ হলো ধোঁকা দেয়া’ এর অর্থ হলো, যে যুদ্ধ একজন ব্যক্তির জন্য উত্তম এবং উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে যথার্থ; তা শুধুমাত্র ধোঁকার মাঝেই রয়েছে; সম্মুখ মোকাবিলায় নেই। এবং এর কারণ হলো এই যে, সম্মুখ মোকাবিলায় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে আর ধোঁকা দিয়ে যে বিজয় লাভ করা যায় তার মাঝে কোন বিপদ নেই।”

আমার (লেখক) বক্তব্য হলোঃ এই হাদীসের মাধ্যমে যুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যকতা তুলে ধরা হয়েছে, কারণ তোমার শত্রু সবসময় চাইবে তোমাকে ধোঁকা দিতে ঠিক যেমনি তুমিও চাও (তাকে ধোঁকা দিতে)। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন,

يَاأَيُّهَاالَّذِينَاَمَنُواخُذُواحِذْرَكُمْ

"হে যারা ঈমান এনেছ! সতর্কতা অবলম্বন কর।" [সূরা আন নিসা ৪ঃ ৭১]

এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরো এক স্থানে বলেছেন,

وَخُذُواحِذْرَكُمْ
"...এবং সতর্কতা অবলম্বন কর।" [সূরা আন নিসা ৪ঃ ১০২]

আর এই কৌশল যদি সংগঠিত সেনাবাহিনীওয়ালা রাষ্ট্রসমূহ ব্যবহার করতে পারে, তাহলে দুর্বল ও সংখ্যালঘু হবার কারণে মুসলিমদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার কতই না বেশী হওয়া উচিৎ? এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, ধোঁকা, কৌশল এবং নিত্য নতুন পদ্ধতির ব্যবহার মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

আর ধোঁকার কিছু কৌশলগত পরিস্থিতি রয়েছে, যা কেবল বিশেষজ্ঞরাই বুঝতে পারে; যেমন ছদ্মবেশ ধরা বা কেমোফ্লাজ (চোখে ধূলা দেয়া); প্রতারণা এবং এর উপযুক্ত সময় এবং এরূপ আরো অন্যান্য বিষয়। তবে আমরা এসব কৌশলের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব না কারণ এই গ্রন্থটি শারীয়াহ সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনার জন্য; কৌশলগত আলোচনা নয়। আমরা এখানে শারীয়াহ এর দৃষ্টিভঙ্গিতে ধোঁকা এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য কৌশলের আলোচনা করব। আর শারীয়াহ সংক্রান্ত বিষয় দু'টি হলো- মিথ্যা বলা এবং গুপ্তহত্যা (আততায়ী হামলা)। এরপর আমরা গোপনীয়তা ও ধোঁকার ব্যাপারে কিছু সাধারণ আলোচনার পাশাপাশি বিশেষ আলোচনাও পেশ করব।

প্রথমতঃ শত্রুর নিকট মিথ্যা কথা বলা।

আমি বলিনি, '... যুদ্ধের সময় মিথ্যা কথা বলা', কারণ শত্রুর কাছে যুদ্ধের সময়ও যেমন মিথ্যা বলা যায় তেমনি যুদ্ধাবস্থা ছাড়াও মিথ্যা বলা যায়, এর প্রমাণ আমি পেশ করব ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

যুদ্ধাবস্থায় মিথ্যা বলার দলীল রয়েছে উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা রদিআল্লাহু আনহার হাদীসে। তিনি বলেন, "আমি কখনো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মিথ্যা অবলম্বন করার অনুমতি দিতে শুনি নাই। তবে তিনটি ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন, যুদ্ধের ব্যাপারে,

মানুষের মাঝে বিবাদ মিটিয়ে সন্ধি ও শান্তি স্থাপনে এবং স্বামী স্ত্রীর সাথে ও স্ত্রী স্বামীর সাথে কথোপকথনে।”

আন নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, “তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমতি এই হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তাদের মধ্যে একটি হলো যুদ্ধ। আত তাবারী বলেনঃ ‘যুদ্ধে যত মিথ্যার অনুমতি রয়েছে তাসবই হলো তাউরিয়া (বক্রোক্তি বা ঘুরিয়ে বলা), মিথ্যা নয়; কারণ এর অনুমতি নেই।’ কিন্তু এটা শুধু তার নিজস্ব বক্তব্য, কারণ প্রকাশ্যভাবে এটি (হাদীস) তিনটি বিষয়ে মিথ্যার অনুমতি দিয়েছে, তবে একে তাউরিয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা উত্তম, ওয়াল্লাহু আলিম (আল্লাহ্ এ ব্যাপারে ভালো জানেন)।”

এবং ইবনে হাযার রহিমাহুল্লাহ বলেন, “আন নববী বলেনঃ ‘ প্রকাশ্যভাবে এটি (হাদীস) তিনটি বিষয়ে মিথ্যার অনুমতি দিয়েছে, তবে একে তাউরিয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা উত্তম।’ এবং ইবনূল আরাবী বলেনঃ ‘এবং যুদ্ধে মিথ্যা কথা বলা সেইসব ব্যতিক্রমসমুহের অন্তর্ভুক্ত, যা মুসলিমদের প্রতি রহমত স্বরূপ হাদীসের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়েছে, যা তাদের প্রয়োজন রয়েছে; এব্যপারে কোন বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই। আর মিথ্যা কথা বলা যদি বিবেকের কারণে হারাম করা হতো তাহলে এর অনুমতি দেযার কোন প্রয়োজন ছিল না।”

আর যুদ্ধাবস্থা ছাড়া শত্রুর সাথে মিথ্যা অবলম্বনের অনুমতি রয়েছে নানা কারণে। এর মাঝে একটি হলো দুনিয়ায় মুমিনের জন্য কিছু সুবিধা অর্জন এবং কাফিরদের অনিষ্ঠ থেকে তাকে রক্ষা করা। এর দলীল হলোঃ

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,
“ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তিনবার ব্যতীত কখনো মিথ্যা বলেননি; তন্মধ্যে দু’বার ছিল আল্লাহ্ আ’জ্জা ওয়া জ্বাল্লের পছন্দে। যেমন তার বক্তব্যঃ নিশ্চয় আমি অসুস্থ.. এবং তার বক্তব্যঃ না! এইটি, এদের সবচেয়ে বড়টি এই কাজ করেছে। এবং তিনি বলেন, ‘একদা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এবং তার পত্নী অত্যাচারী শাসকদের মধ্যে কোন এক শাসকের এলাকায় এসে পৌছালেন (তা ছিল মিসর)। তখন তাকে (শাসককে) সংবাদ দেয়া হলো যে, এ এলাকায় একজন লোক এসেছে। তার সাথে একজন সর্বাপেক্ষা সুন্দরী স্ত্রী রয়েছে। তখন সে (রাজা) তার (ইব্রাহীম) কাছে লোক পাঠালো। সে তাকে মহিলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, এ মহিলাটি কে? তিনি উত্তর দিলেন মহিলাটি আমার বোন। তারপর তিনি সারার কাছে আসলেন এবং বললেন, হে সারা আমি ছাড়া পৃথিবীর উপর আর কোন মু’মিন নেই। এ লোকটি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। তখন আমি তাকে জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। কাজেই তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর না।” ইবনে

হাযার রহিমাহুল্লাহ তার ব্যাখ্যায় বলেন, ‘‘অন্যথায় এমন পরিস্থিতিতে প্রকাশ্য মিথ্যা বলা জায়েজ, এমনকি এটা কর্তব্যের পর্যায়ে পড়ে যখন একটি ছোট অন্যায়ের দ্বারা অনেক বড় অন্যায় দমন করা যায়। আর এগুলোকে মিথ্যা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি এটাকে অন্য মিথ্যার মতো নিন্দনীয় বলতে চাননি, যদিও এটা অপমানজনক এবং অনৈতিক; কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে এটি উত্তম, এই ঘটনাটি তারই একটি উদাহরণ। তিনি বলেছেনঃ ‘...তন্মধ্যে দু’বার ছিল আল্লাহ্ আ’জ্জা ওয়া জ্বাল্লের পছন্দে’। তিনি এই দুটোকে সারার কাহিনী থেকে পৃথক করেছেন, কারণ যদিও সেটি আল্লাহ্রই পছন্দে ছিল, তারপরও এরমাঝে তার নিজেরও কিছুটা স্বার্থ ছিল; আর বাকি দু’টির পুরোটাই ছিল আল্লাহ্র জন্য। এবং হাস্সান রদিআল্লাহু আনহুর বর্ণনায় এসেছে, ‘‘ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তিনবার ব্যতীত কখনো মিথ্যা বলেননি; প্রত্যেকবারই ছিল আল্লাহ্ আ’জ্জা ওয়া জ্বাল্লের পছন্দে।’’’’

আমার বক্তব্য হলোঃ সুতরাং এই মিথ্যা, যার মাঝে দ্বীনী সুবিধা রয়েছে এবং এর মাঝেই রয়েছে কাফিরদের অনিষ্ট থেকে পালাবার সুযোগ।

‘আসহাবুল উখদুদের’ ঘটনা- শুআইব রদিআল্লাহু আনহু হতে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘‘পূর্বকালে এক বাদশাহ ছিল। তার দরবারে ছিল এক যাদুকর। সে বৃদ্ধ হয়ে গেলে বাদশাহকে বলেঃ আমি তো এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং

আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসছে। সুতরাং আমাকে এমন একটি ছেলে দিন যাকে আমি ভালোভাবে যাদুবিদ্যা শিখাতে পারি। তারপর সে একটি মেধাবী বালককে যাদুবিদ্যা শিখাতে শুরু করে। বালকটি তার গুরুর কাছে যাবার পথে এক আবেদের ঘরের পাশদিয়ে যেত। সেই আবেদও কখনো ঘরে বসে ইবাদত করতেন, আবার কখনো জনগনের উদ্দেশ্যে ওয়াজ নসীহত করতেন। বালকটিও পথের পাশে দাঁড়িয়ে ইবাদতের পদ্ধতি দেখতো এবং ওয়াজ নসীহত শুনতো। এ কারণে যাদুকরের কাছেও মার খেত এবং বাড়িতে বাপমায়ের কাছেও মার খেত। কারণ যাদুকরের কাছেও যেমন দেরীতে পৌছাতো তেমনি বাড়িতেও দেরী করে ফিরতো। একদিন সে আবেদের কাছে তার দুরবস্থার কথা বর্ণনা করলো। আবেদ তাকে বলে দিলেনঃ যাদুকর দেরীর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলবে যে, মা দেরী করে বাড়ি থেকে আসতে দিয়েছেন, কাজ ছিল। আবার মার কাছে গিয়ে বলবে যে, যাদুকর দেরী করে ছুটি দিয়েছেন।”

আন নববী রহিমাহুল্লাহ তার ব্যাখ্যায় বলেন, “এর মাঝে যুদ্ধের সময় ও সেরকম পরিস্থিতিতে মিথ্যা বলার অনুমতি রয়েছে এবং সেইসাথে কাউকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্যও এই অনুমতি রয়েছে, হতে পারে তার নিজের জন্য অথবা অন্য কাউকে বাঁচাবার জন্য যার পবিত্রতা রয়েছে।”

লেখকের বক্তব্যঃ আর এটি কোন যুদ্ধের পরিস্থিতি নয়। বরং আমার বিশ্বাস যে আন নববী এটাই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন যে, যুদ্ধাবস্থা ছাড়াই কাফিরদের নিকট মিথ্যা বলা যদি জায়েজ হয় তাহলে যুদ্ধাবস্থায় এটি আরো গ্রহণযোগ্য হবে। এবং উপরোক্ত হাদীস ও ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের হাদীসের মাঝে , কাফিরদের অনিষ্ট থেকে মুক্তি লাভের জন্য মিথ্যা বলার অনুমতি রয়েছে। এবং আন নববী অন্যত্র বলেনঃ "তারা বলেছিল, 'এবং এক্ষেত্রে কোন মতভেদ নেই যে, যদি একজন যালিম এমন কোন মানুষকে হত্যা করতে যায় যে আরেক ব্যক্তির আশ্রয়ে ছিল তবে ঐ ব্যক্তির (আশ্রয়দাতা) কর্তব্য হলো মিথ্যা বলা যে, সে (আশ্রিত) কোথায় আছে সে জানে না।

এবং এই দুনিয়ার সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে কোন কাফিরকে মিথ্যা বলারও অনুমতি রয়েছে। এবং এ ব্যাপারে আল হাজ্জাজ ইবনে ইলাতের ঘটনা উল্লেখযোগ্য যা ইবনে হাযার 'যুদ্ধাবস্থায় মিথ্যা বলা' সংক্রান্ত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "আর এ বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় আহমাদ এবং ইবনে হিববান কর্তৃক বর্ণিত আনাস রদিআল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে; এটি আল হাজ্জাজ ইবনে ইলাতের ঘটনা সংক্রান্ত যা আন নাসাঈও বর্ণনা করেছেন এবং আল হাকিম একে সহীহ বলেছেন। সে (আল হাজ্জাজ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চেয়েছিল যে, সে মক্কাবাসীর কাছ থেকে তার সম্পদ নেয়ার জন্য তার ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই বলবে; এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন যে, সে যেন

মক্কাবাসীকে জানায় যে, খায়বারবাসী মুসলিমদের পরাজিত করেছে এবং এ ব্যাপারে আরো যা কিছু প্রচলিত আছে।"- এরপর তিনি (ইবনে হাযার) বলেন- "আল হাজ্জাজ ইবনে ইলাতের ঘটনাও যুদ্ধের সময়কার নয়।" ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহও তার গ্রন্থ 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' -তে আল হাজ্জাজের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

লেখকের বক্তব্যঃ এটাই ছিল যুদ্ধাবস্থায় অথবা যুদ্ধাবস্থা ছাড়া শত্রুর কাছে মিথ্যা বলার ব্যাপারে আলোচনা। আর এ সবই ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ একজন মুহারিব (যুদ্ধরত) কাফিরকে আততায়ী আক্রমনে হত্যা করার অনুমতি।
'মুহারিব' অর্থ হলো, যুদ্ধরত বা যার সাথে কোন শান্তি চুক্তি নেই এবং হাদীসের বর্ণনায় এই বিষয়টি (গুপ্তহত্যা) তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের কথা এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যাদের অনিষ্ট সবচেয়ে বেশী। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাঁর কিতাবে ইঙ্গিত দিয়েছেনঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

"...তখন মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো, তাদের পাঁকড়াও করো, তাদেরকে ঘেরাও করো এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁত পেতে

বসে থাকো।” [সূরা আত-তাওবাহ ৯ঃ ৫]

আল কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, “... এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁত পেতে বসে থাকো” অর্থাৎ তাদেরজন্যঐসব গোপন স্থানে অপেক্ষা করো যেখানে নজরদারী রাখে। এটি দাওয়াহ দেয়ার পূর্বে তাদেরকে গুপ্ত আক্রমনে হত্যা করার অনুমতির দলীল ।” লেখকের বক্তব্যঃ কুরতুবীর উক্তি, “...দাওয়াহ দেয়ার পূর্বে..” -এর মানে হলো, যার কাছে দাওয়াহ আগেই পৌছে গেছে। এবং এই আয়াতঃ “... এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁত পেতে বসে থাকো”- এর মাঝে শত্রুর ওপর নজরদারী, গোয়েন্দাগিরি এবং গুপ্তচরবৃত্তির অনুমোদন রয়েছে।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহেত আমরা কাব ইবনে আল আশরাফ এবং আবু রাফি ইবনে আবু আল হুকাইকের এর ঘটনাদ্বয় দেখতে পাই, যারা উভয়েই ছিল ইয়াহুদী।

কাব মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের অনুপ্রেরণা যোগাত এবং সে তার কবিতার দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননা করতো এবং মুসলিম নারীদের নিয়ে কুৎসিতভাষায়কবিতালিখত।তাকেহত্যারকাহিনীবুখারীওমুসলিমউভয়েইবর্ণনা করেছেন।

জাবির রদিআল্লাহু আনহুর সূত্রে বুখারী বর্ণনা করেছেন, “রাসূলুল্লাহ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘কাব ইবনে আল আশরাফের (সাথে বোঝাপড়ার) জন্য কে আছো? এই লোকটি আল্লাহ্ তা‘আলা এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে।’ অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ দাঁড়ালেন এভং বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি?’ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘হ্যা’। তিনি (মাসলামাহ) বললেন, ‘তবে আপনি আমাকে কিছু কথা বলার অনুমতি দিন।’ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘বলতে পারো’। সুতরাং মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ তার কাছে গেলেন।’’ এবং এই হাদীসে রয়েছে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ এবং তার সঙ্গীরা কাবকে এই বলেধোঁকা দিয়েছিলেন যে, তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণে অতীষ্ট এবং তারা তাকে হত্যা করার পূর্ব পর্যন্ত ধোঁকার মাঝে রেখেছিলেন, অথচ তখন সে ছিল এক সুরক্ষিত দূর্গের অভ্যন্তরে।

ইবনে হাযার রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘‘এবং ইকরিমাহ রদিআল্লাহু আনহুর বর্ণনায় রয়েছে, ‘সুতরাং ইয়াহুদীরা ভীত হয়ে পড়লো, সুতরাং তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলো এবং বলল, ‘আমাদের নেতা আততায়ী হামলায় নিহত হয়েছেন’। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে তার(কাব) কৃতকর্মের কথা স্মরণ করালেন, সে কিসের দ্বারা তার বিরোধিতা করতো এবং মুসলিমদের অবমাননা করতো।’ ইবনে সাদ তার বর্ণনায় যোগ করেছেন, ‘সুতরাং তারা ভয় পেয়ে গেল এবং এরপর আর কিছুই বলল না।’-’’ ইবনে

হাযার আরো বলেছেন, ‘‘এবং এতে একজন মুশরিককে দাওয়াহ দেয়ার আগে হত্যা করার অনুমতি আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ দাওয়াহ তার কাছে পৌছেছে। এবং এর মাঝে যুদ্ধের সময় প্রয়োজনীয় যেকোন কথা বলার অনুমতি অনুমতি আছে, যদিও সে আসলে ঐ কথাটি বলতে চায়নি।’’ এবং বুখারী এই হাদীসটি ‘যুদ্ধে মিথ্যা বলা’ এবং ‘মুহারিবকে আততায়ী আক্রমনে হত্যা করা’ু উভয় অধ্যায়েই আলোচনা করেছেন।

লেখকের বক্তব্যঃ কেউ যদি বলে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত কাফিরকে আততায়ী আক্রমনে হত্যা করা একরকম বেঈমানী অথবা ইসলামে নিষিদ্ধ; তাহলে সেই ব্যক্তি বিভ্রান্ত এবং যার মাঝে কিতাব ও সুন্নাহর প্রতি ‘তাকছিব’ (সত্যতা গ্রহণ না করা) রয়েছে। আন নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘‘তিনি- আল কাযী আইয়াদ- বলেন, ‘তার হত্যাকান্ড বেঈমানী ছিল এমনটি বলা জায়েজ নয়। এবং একজন ব্যক্তি একটি মজলিসে একথা বলেছিল এবং আলী ইবনে আবু তালিব রদিআল্লাহু আনহু সেখানে উপস্থিত ছিলেন; সুতরাং তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন।’’ এবং (আলীর) এই ঘটনাটি আল কুরতুবী আল্লাহ্ তা‘আলার ঐ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন,

فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ

“... কাফিরদের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করো।’ [সূরা আত-তাওবাহ ৯ঃ ১২]

ইবনে তাইমিয়্যাহ এটি তার গ্রন্থ ‘আস সারাম আল মাসলুল আলা শাতিম আর রাসূল’-এ উল্লেখ করেছেন। এবং তিনি মুআবিয়া এবং মাসলামাহ রদিআল্লাহু আনহুমের মধ্যে সংঘটিত একটি ঘটনা বর্ণনা করেন।

আবু রাফি ইবনে আবু আল হুকাইক ছিল খায়বারে একজন ইয়াহুদী এবং সে ছিল আরবের একজন ব্যবসায়ী। সে মক্কায় যায় এবং কুরাইশদের মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে, ফলে তারা আল আহযাব (মিত্র বাহিনী) জড়ো করে এবং আহযাবের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। সে-ই ছিল এই আগুনের ইন্ধনদাতা। আল বুখারী, আল বারা ইবনে আযিব রদিআল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু রাফে আল ইয়াহুদের নিকট আনসারদের কিছু লোক পাঠালেন, এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আতিককে তাদের ওপর নেতৃত্ব দিলেন। আর আবু রাফে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে অপমান করতো এবং তাঁর বিরুদ্ধে অন্যদের সাহায্য করতো। এবং সে আল হিযাজের ভূখন্ডে তার একটি দূর্গে থাকতো।” একই সূত্রে বর্ণিত আরো একটি হাদীসে রয়েছে, “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু রাফের নিকট একটি

দল পাঠালেন। রাতে সে যখন ঘুমিয়ে ছিল, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক তার ঘরে প্রবেশ করেন এবং তাকে হত্যা করেন।" ইবনে আতিক রদিআল্লাহু আনহু ঐ দূর্গে ঢোকার পর থেকে তাকে হত্যা করার আগ পর্যন্ত নানা প্রকার ধোঁকার আশ্রয় নিয়েছিল। সে ইয়াহুদীদের দরজাগুলো বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল। এরপর তিনি আবু রাফের নিকট যান এবং তিনি যে ঘরেই প্রবেশ করেছেন, সেটাই তিনি ভেতর থেকে বন্ধ করেছেন এবং তিনি তার কণ্ঠস্বর বিকৃত করে আবু রাফেকে ডেকেছেন, যাতে সে তাকে চিনতে না পারে।

ইবনে হাযার রহিমাহুল্লাহ বলেন, "এই হাদীসে বেশ কয়েকটি উত্তম জিনিষ রয়েছে; তার মধ্যে অন্যতম হলো সেই মুশরিককে হত্যা করার অনুমতি যার কাছে দাওয়াহ পৌছেছে এবং সে এর বিরোধিতায় লিপ্ত থেকেছে; এবং তাকে হত্যার অনুমতি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অন্যদের সহযোগিতা করে তার হাত দিয়ে (শারিরিকভাবে) অথবা তার অর্থ দিয়ে অথবা তার জিহবা দিয়ে; এবং যুদ্ধরত শত্রুর উপর গুপ্তচরবৃত্তি করার এবং তাদের অসতর্ক অবস্থার সন্ধান করার অনুমতি; মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিষ্ঠার সাথে নিয়োজিত থাকার গুরুত্ব এবং কোন সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে অথবা বিপুল সংখ্যক মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের স্বল্প সংখ্যার কারণে তাদের সাথে অস্পষ্ট কথা বলার অনুমতি।" আল বুখারী এই ঘটনাটি তার কিতাবুল জিহাদে 'ঘুমন্ত মুশরিককে হত্যা করা' আলোচনা করেছেন।

আর শেখ আব্দুর রহমান আদ দাওসারী রহিমাহুল্লাহ আল্লাহ্র আয়াতের তাফসীরে ইবাদতের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা দিতে গিয়ে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আয়াতটি হলো,

إِيَّاكَنَعْبُدُوَإِيَّاكَنَسْتَعِينُ

“আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।” [সূরা আল পাতিহা ১ঃ ৫]

তিনি বলেন, “সুতরাং কারো সাধ্যানুযায়ী শক্তি সঞ্চয় করা দ্বীনী দায়িত্ব এবং এটি প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তার মাঝে পড়ে। সুতরাং যে সঠিকভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করে, সে কখনোই এটি ত্যাগ করা বা স্থগিত করা বা একে হাল্কাভাবে নেয়ার মতো অন্যায় করতে পারে না। এবং আল্লাহ্র যে ইবাদতকারী জিহাদের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সে কাফিরদের নেতা, নাস্তিকতার দিকে আহবানকারী এবং সর্বত্র আপোষকারী (Liberal) নেতাদের এবং প্রতিটি কাফির যে আল্লাহ্র আয়াতকে আক্রমন করে এবং যে তার কলমে ও তার প্রচারণায় এই সত্য ধর্মের বিরোধিতা করে এমন সবাইকে হত্যা করার জন্য অভিযান চালাবে, কারণ তারা আল্লাহ্ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপমানকারী। দুনিয়ার কোন প্রান্তে কোন বিশেষ (আলেম বা মুজাহিদ) বা কোন সাধারণ মুসলিমের জন্য ঐ ব্যক্তিকে বাঁচতে দেয়া জায়েজ নয়,

কারণ সে ইবনে আবু হাকাইক বা অন্যান্যদের চেয়েও বেশী অনিষ্টসাধনকারী, যাদেরকে হত্যা করার জন্য আল্লাহ্ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং হুকুম দিয়েছেন। সুতরাং বর্তমান সময়ে তাদের উত্তরাধিকারীদের হত্যা পরিকল্পনা বাদ দেয়ার অর্থ হলো আল মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে চরম ব্যতিক্রম করা, আল্লাহ্র দ্বীনের ধ্বংসকারীদের ভয়াবহ ও ঘৃণ্য উপায়ে বৈধতা দান করা। এই পরিস্থিতিকে শুধুমাত্র আল্লাহ্র দ্বীন রক্ষার প্রতি অন্তরের আকাঙ্ক্ষার অভাব (আল ঘিরাহ) এবং আল্লাহ্র গযব আনয়ণ করার শামিলরূপেই ব্যাখ্যা করা যায়। আর এটা আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ও তাদের প্রতি সম্মানের অভাবেই হয়ে থাকে, যা কখনোই তার কাছ থেকে আসবে না যে সুষ্ঠূ ও সঠিকভাবে আল্লাহ্র ইবাদত প্রতিষ্ঠিত করেছে।"

লেখকের বক্তব্যঃ এখানে একটি লক্ষনীয় বিষয় রয়েছে, আর তা হলো, যদি কখনো কোন কাফিরকে মারার জন্য নারী ও শিশুকে হত্যা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে (অর্থাৎ তাদেরহত্যানাকরেঐকাফিরকেহত্যাকরাসম্ভবনাহয়) তাহলে এই পরিস্থিতিতে নারী ও শিশু হত্যা করা যাবে কি যাবে না? এর উত্তর হলোঃ যদিও তারা কোনরূপ যুদ্ধ করেনি তারপরও তাদেরকে হত্যা করা যাবে যদি তাদেরকে হত্যা না করে ঐ কাফিরকে হত্যা করা অসম্ভব হয়; এক্ষেত্রে তাদেরকে হত্যার কোন নিয়্যত থাকতে পারবে না। এ ব্যাপারে

দুইটি হাদীস পাওয়া যায়ঃ
ইবনে উমর রদিআল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন এক যুদ্ধে জনৈকা মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।"

আস সাব ইবনে জাছামাহ রদিআল্লাহু আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে আমার কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যেসকল মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ হচ্ছে, যদি রাত্রীকালীন আক্রমনে তাদের মহিলা ও শিশুগণ নিহত হয় তাহলে কি হবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যদি অশ্বারোহীগণ রাতের আধারে আক্রমন চালায় এবং তাতে মুশরিকদের শিশুসন্তান মারা যায়, (তবে কি হবে)? তিনি বললেন, তারাও তাদের পিতাদের অন্তর্গত।"

আন নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "' তারাও তাদের পিতাদের অন্তর্গত'- অর্থাৎ, এতে কোন সমস্যা নেই কারণ তাদের পিতাদের ব্যাপারে হুকুম তাদের ওপর বর্তায় যেমন, উত্তরাধিকার, বিবাহ, কিসাস, দিয়াত (রক্তপণ) এবং আরো অন্যান্য বিষয়। আর এক্ষেত্রে এটাই বোঝানো

হয়েছে যে, জরুরী অবস্থায় পড়া ছাড়া তাদেরকে হত্যা করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না; আর যে হাদীসে নারী ও শিশুদের হত্যা করাকে নিষিদ্ধ হয়েছে সেটা তখনই প্রযোজ্য যখন তাদেরকে পৃথক করা সম্ভব (যাকে হত্যা করা প্রয়োজন তার থেকে উপস্থিত নারী ও শিশুকে পৃথক করা)। রাত্রীকালীন আক্রমন এবং রাত্রীকালীন আক্রমনে নারী ও শিশুহত্যার অনুমতি সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাপারে আমাদের বিশেষজ্ঞ অভিমত (মাযহাব); সেই সাথে মালিক ও আবু হানিফার এবং অধিকাংশের অভিমত। আর রাত্রীকালীন আক্রমনের মানে হলো তাদের বিরুদ্ধে রাতের আক্রমন করা যাতে পুরুষদেরকে নারী ও শিশুদের থেকে আলাদা কওে চেনা সম্ভব হয় না।"

আর ইবনে কুদামাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "এবং রাতে তাদেরকে আক্রমন করা জায়েজ এবং এর মানে হলো রাতে তাদেরকে অতর্কিতে আক্রমন করা এবং তাদেরকে হত্যা করা যখন তারা অপ্রসত্মুত থাকে। আহমাদ বলেন, 'রাতে আক্রমন করার মধ্যে কোন সমস্যা নেই। আর তারা (সাহাবাগণ) কি রোমানদের রাতে ছাড়া (অন্য সময়ে) আক্রমন করেছিল?' এবং তিনি বলেন, "আমরা এমন কারো ব্যাপারে জানিনা যে, রাতে কাফিরদের আক্রমন করাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন?" এবং সুফিয়ান উল্লেখ করেন, আয যুহরী থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস থেকে, তিনি আস সাব ইবনে জাছামাহ থেকে, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে আমার কাছ দিয়ে

পথ অতিক্রম করেন। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যেসকল মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ হচ্ছে, যদি রাত্রীকালীন আক্রমনে তাদের মহিলা ও শিশুগণ নিহত হয় তাহলে কি হবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।' এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'এর রিওয়ায়াত (বর্ণনাসূত্র) উত্তম।' সুতরাং যদি বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারী ও শিশুদের হত্যা করতে বারণ করেছেন, তবে আমরা বলব, সেটি তাদের ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ব্যাপারে প্রযোজ্য। আহমাদ বলেন, 'যদি তাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ব্যাপার হয়, তবে (তা জায়েজ) না।' তিনি বলেন, আস সাবের হাদীসটি এসেছে নারী ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধ হবার পরে, নারী ও শিশু হত্যার ব্যাপারে তার নিষেধ এসেছে যখন তিনি ইবনে আবু হুকাইককে হত্যার জন্য লোক পাঠান আর এজন্যই এই দু'টির মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব; ইচ্ছাকৃতভাবে (তাদের হত্যা) করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এবং এ অন্যক্ষেত্রে বিশেষ অনুমতি।"

এবং আবু বাকর আল হাযিমি এই দু'টি হাদীস উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, একদলের (আলেম) অভিমত হলো যে, প্রথম হদীছটি দ্বারা দ্বিতীয়টি রহিত হয়েছে এবং অপরদলের অভিমত হলো এর বিপরীত, এবং অপর দলটি এই দু'টি হাদীসের মধ্যে সমন্বয় করার অভিমত গ্রহণ করেছেন। এরপর তিনি আশ শাফিঈর বক্তব্য পেশ করেন, যা সমন্বয়ের মতটি সমর্থন করে, "আশ শাফিঈ বলেন, আস সাবের হাদীসটি হলো

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উমরাহ্কালীন সময়ের; সুতরাং এটি যদি প্রথম উমরাহ্ এর সময় হয় তবে আবু হুকাইক তো তার আগেই নিহত হয়েছে এবং বলা হয়ে থাকে এটি একই বছরে সংঘটিত হয়। আর যদি এটি দ্বিতীয় উমরাহ্ এর সময় হয় তবে সন্দেহাতীতভাবে এটি আবু হুকাইকের ঘটনার পরে। ওয়াল্লাহু আলেম।'

আশ শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আর এই অভিমত নেই না যে, তিনি নারী ও শিশুদের হত্যার ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন এবং পরবর্তীতে তা নিষিদ্ধ করেছেন। আমাদের মতে, নারী ও শিশু হত্যার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা হলো তাদেরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করার ক্ষেত্রে এবং যেসব পরিস্থিতিতে তাদেরকে ঐসব ব্যক্তি (টার্গেট) থেকে সনাক্ত ও আলাদা করা সম্ভব সেসব পরিস্থিতির জন্য। '... তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত'- এই বক্তব্যের অর্থ দ্বারা তাদের দু'টি বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়; প্রথমত তারা ঈমানের পরিধিতে নেই, থাকলে তাদের রক্ত ঝরানো (মুসলিমদের জন্য) হারাম হতো এবং দ্বিতীয়ত, তারা দারুল ঈমানে বসবাসকারীদের মধ্যেও গণ্য নয়, নতুবা তাদের ঘরে আক্রমন করা নিষিদ্ধ হতো। আর একারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত্রীকালীন আক্রমন ও তাদের ঘরে আক্রমন করার অনুমতি দিয়েছেন এবং তিনি বনু মুসতালিকের উপর আক্রমন করেছেন যখন তারা অপ্রসত্মুত ছিল। আর এ কথা সবারই জানা যে, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি সাপেক্ষে কেউ রাত্রীকালে আক্রমন চালালে নারী ও শিশুদের আক্রান্ত না করে তা

সম্পন্ন করতে পারবে না। ... এবং তাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা ঠিক নয় যখন তাদেরকে আলাদা করা এবং চেনা সম্ভব হয়। শিশুদের হত্যার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণ হলো তারা এখনো কুফরের উপর বয়োপ্রাপ্ত হয়নি যার জন্য তাদেরকে হত্যা যায়; আর নারীদের হত্যা করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণ হলো যে, তাদের মধ্যে যুদ্ধে জড়াবার কোন আগ্রহ বা ইচ্ছা নেই; আর তাছাড়া তারা এবং তাদের সন্তানেরা তো এক প্রকারের দান, যা দ্বারা মহিমান্বিত পরাক্রমশালী আল্লাহ্র দ্বীনের অনুসারীরা আরো শক্তিশালী হয়।"

লেখকের বক্তব্যঃ আশ শাফিঈর বক্তব্য এবং আন নববীর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ হলোঃ কাফিরদের মধ্যে যাদের হত্যার উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালিত হয় তাদের থেকে ঐসব নারী ও শিশুদের আলাদা করা বা চেনা সম্ভব না হলে, তাদেরকে (নারী ও শিশু) হত্যার মাঝে কোন পাপ নেই- যতক্ষণ না তাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হচ্ছে। এবং আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এব্যাপারে ভালো জানেন।

তৃতীয়তঃ ইসলামে গোপনীয়তা রক্ষার গুরুত্ব

ইসলামে গোপনীয়তা হতে পারে দাওয়াহর ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এবং যুদ্ধাভিযানের ক্ষেত্রে। এবং প্রত্যেকটির ব্যাপারে দলীল আছেঃ

ক. দাওয়াহর ক্ষেত্রে গোপনীয়তাঃ

ইসলামে দাওয়াহর মূলনীতি হলো যে, এটি ঘোষণা করতে হবে প্রকাশ্যে। কারণ এই দাওয়াহ সমগ্র সৃষ্টির জন্য। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন,

يَاأَيُّهَاالرَّسُولُبَلِّغْمَاأُنْزِلَإِلَيْكَمِنْرَبِّكَوَإِنْلَمْتَفْعَلْفَمَابَلَّغْتَرِسَالَتَهُ

"হে রাসূল! যা কিছু আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌছে দিন। যদি তা না করেন তাহলে তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না।" [সূরা আল মায়িদা ৫ঃ ৬৭]

তারপরও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দাওয়াহকে ততদিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ অনুমতি দিয়েছেন।

"আপনার সালাত অনেক উঁচু আওয়াজেও পড়বেন না আবার খুব নিচু আওয়াজেও পড়বেন না।" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আববাস রদিআল্লাহু আনহু বলেছেন (ঈমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত), এটি তখন নাযিল হয় যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায়

নিজেকে গোপন রেখেছিলেন। ইবনে হাযার বলেন, “‘মক্কায় নিজেকে গোপন রাখার’ অর্থ হলো ইসলামের প্রাথমিক সময়।”

فَاصْدَعْبِمَاتُؤْمَرُوَأَعْرِضْعَنِالْمُشْرِكِينَ

“তাই হে নাবী! যে বিষয়ে আপনাকে হুকুম দেয়া হচ্ছে, তা জোরে শোরে বলে দিন এবং যারা শিরক করে তাদের মোটেও পরওয়া করবেন না।” [সূরা আল হিজর ১৫ঃ ৯৪]
আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা)র এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “এবং আবু উবাইদা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোপন ছিলেন যতদিন না এই আয়াতঃ ‘যে বিষয়ে আপনাকে হুকুম দেয়া হচ্ছে, তা জোরে শোরে বলে দিন’ নাযিল হয়।”

খ. ঈমানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গোপনীয়তাঃ ‘ঈমান গোপন করা’

আর এর দলীল হলোঃ

· আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা)র আয়াত,

وَقَالَرَجُلٌمُؤْمِنٌمِنْآلِفِرْعَوْنَيَكْتُمُإِيمَانَهُ

“এ সময় ফিরাউনের বংশের এক মুমিন ব্যক্তি যে তার ঈমান গোপন করে রেখেছিলো সে বলে উঠলো,..” [সূরা আল গাফির ৪০ঃ ২৮]

· আসহাবে কাহাফের ব্যাপারে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা) বলেন,

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْبِوَرِقِكُمْهَذِهِإِلَىالْمَدِينَةِفَلْيَنْظُرْ أَيُّهَاأَزْكَىطَعَامًافَلْيَأْتِكُمْبِرِزْقٍمِنْهُوَلْيَتَلَطَّفْوَلَايُشْعِرَنَّبِكُمْأَحَدًا * إِنَّهُمْإِنْيَظْهَرُوا عَلَيْكُمْيَرْجُمُوكُمْأَوْيُعِيدُوكُمْفِيمِلَّتِهِمْوَلَنْتُفْلِحُوا إِذًاأَبَدًا

“এখন চলো তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন একজনকে রূপার এই মূদ্রাটি দিয়ে শহরে পাঠাও। সে দেখুক সবচেয়ে ভালো খাবার কোথায় পাওয়া যায়। সেখান থেকে সে কিছু খাবার নিয়ে আসুক। সে যেন সাবধান থাকে, যাতে কেউ তোমাদের এখানে থাকার কথা টের না পায়। যদি তোমাদের কথা তাদের কাছে প্রকাশ পায় তাহলে অবশ্যই তারা তোমাদেরকে পাথর মেরে শেষ করবে অথবা তাদের দ্বীনে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিবে।” [সূরা আল কাহ্ফ ১৮ঃ ১৯-২০]

তাঁর এই আয়াতে গোপনীয়তা রক্ষার কথা বলা হয়েছে, “যাতে কেউ তোমাদের এখানে থাকার কথা টের না পায়”।

· ইবনে আববাস রদিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আল মিকদাদ রদিআল্লাহু আনহুকে বলেন,

“কোন ব্যক্তি যদি কাফিরদের সাথে অবস্থানকালে তার আপন ঈমান গোপন রাখে, এবং এরপর সে তার ঈমান প্রকাশ করার পর তাকে হত্যা করা হয়। তুমিও তো মক্কায় থাকাকালে তোমার ঈমান গোপন রেখেছিলে।”

· আর আবু যার আল গিফারী রদিআল্লাহু আনহুর ঘটনায় লক্ষ্য করা যায়, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রবেশ করলেন; তিনি বললেন, “আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন।” আল্লাহ্র রাসূল আমার কাছে ইসলাম পেশ করলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে গেলাম। এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, “হে আবু যার! তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখো এবং তোমার এলাকায় চলে যাও। আমরা প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করেছি, একথা শোনার পর আমাদের সাথে এসে দেখা করবে।” আমি সেই সত্ত্বার শপথ করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি কাফিরদের সামনে প্রকাশ্যে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করবো।”

· এবং আল হাজ্জাজ ইবনে ইলাত আস সুলামী রদিআল্লাহু আনহু তার ইসলাম মক্কাবাসীদের থেকে গোপন রাখেন। এবং মক্কায় তার সম্পদ উদ্ধারের জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে তাদের নিকট মিথ্যা বলার অনুমতি চেয়েছেন।

· এবং মুসলিম তার ‘‘কিতাবুল ঈমান’’-এ, ‘ভীত ব্যক্তির জন্য ঈমান গোপন রাখার অনুমতি’ অধ্যায়ে হুযাইফা রদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘‘আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন আমাদের বললেনঃ গণনা করতো, কতজন মানুষ ইসলামের কথা ঘোষণা করে। আমরা বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আমাদের ব্যাপারে আশংকা করছেন? আমরা তো প্রায় ছয়শ থেকে সাতশ লোক আছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমরা জানো না, অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হবে। সাহাবী বলেন, পরবর্তীতে সত্যিই আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হই, এমনকি আমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে গোপনে সালাত আদায় করতে হতো।’’ আন নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘‘‘ এমনকি আমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে গোপনে সালাত আদায় করতে হতো’ -এর দ্বারা সম্ভবত কোন সংঘটিত ফিৎনারকথাবলাহয়েছে।’’

লেখকের বক্তব্যঃ আপনারা দেখলেন যে, ঈমান গোপন রাখার (যাকে আমরা ‘গোপনীয়তা’ হিসেবে আলোচনা করেছি) অনুমতি রয়েছে এবং এটি ইসলামী শারীয়াহ এর অন্তর্গত, বিশেষ করে ঐ সকল মূহুর্তে যখন কাফিরদের থেকে কোন প্রকার ক্ষতির আশংকা থাকে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘‘মু’মিনদের মধ্যে কেউ যদি এমন

কোন এলাকায় থাকে যেখানে সে অত্যাচারিত অথবা এমন কোন সময়ে অবস্থান করে যখন সে অত্যাচারিত, তাহলে সে ধৈর্য্যের আয়াত সমুহের উপর আমল করবে এবং কিতাবীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে যারা অপমান করে তাদের থেকে এবং মুশরিকদের থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য আমল করবে। আর যারা সক্ষম তার জিহাদের ঐসব আয়াতের উপর আমল করবে যেখানে দ্বীনের অপমানকারী কাফির নেতাদের সাথে এবং কিতাবীদের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা হীন অবস্থায় জিযিয়া দেয়।"

সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা

আমি আগেই বলেছি যে, দাওয়াহর মূলনীতি হলো প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়া; আর এক্ষেত্রে গোপনীয়তা একটি ব্যতিক্রম মাত্র। তবে সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ঠিক উল্টো। এক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করাই মূল নীতি। এমন যে কোন কৌশল গ্রহণ করাই আবশ্যক যা তথ্য, রহস্য এবং গতিবিধি গোপন রাখতে সাহায্য করে। আর এসব করার মূল লক্ষ্যই হলো শত্রুকে অবাক করে দিয়ে তাদের অজান্তে আক্রমন শানানো, আর এটাই বিজয়ের অন্যতম হাতিয়ার। সামরিক অভিযানের গোপনীয়তার ব্যাপারে দলীলগুলো হলোঃ

· বুখারীর বর্ণনায় তাবুকের যুদ্ধে কাব ইবনে মালিক রদিআল্লাহু আনহুর

পিছিয়ে পড়ার ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি বলেন, ‘‘রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোথাও জিহাদে যাওযার ইচ্ছা করলে অন্য স্থানের কথা বলে গন্তব্য স্থানের কথা গোপন রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে অত্যধিক গরমের সময় তাবুকের যুদ্ধে যান। সফর ছিল অনেক দূরের। অঞ্চল ছিল খাদ্য ও পানীয়হীন। আর শত্রুসৈন্যের সংখ্যাও ছিল বেশী। তাই তিনি মুসলিমদের কাছে এই জিহাদের কথা খুলে বলে দিলেন, যাতে সবাই জিহাদের জন্য ঠিকমতো প্রসত্মুত হতে পারেন। তিনি তাদেরকে ঈঙ্গিতের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছার কথা জানিয়ে দিলেন।’’ সুতরাং ‘ ‘‘রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোথাও জিহাদে যাওযার ইচ্ছা করলে অন্য স্থানের কথা বলে গন্তব্য স্থানের কথা গোপন রাখতেন’ -এই কথার দ্বারা বোঝা যায় যে সামরিক অভিযানের মূলনীতি হলো গোপনীয়তা রক্ষা করা। এবং আবু দাউদ তার বর্ণনায় এই কথাটিও যুক্ত করেনঃ ‘‘তিনি প্রায়ই বলতেন, ‘যুদ্ধ হলো ধোঁকা দেয়া’।’’ আর হাদীসে একটি গোপনীয়তার ব্যাপারে একটি শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। সেটা হলো এই যে, একজন আমীর তার গন্তব্যের কথা অধঃস্তনদের অধিকাংশকে না জানিয়ে সৈন্য বাহিনী নিয়ে বের হতে পারবেন। কাবের হাদীস থেকে এ ব্যাপারটি জানা যায়, ‘ তাই তিনি মুসলিমদের কাছে এই জিহাদের কথা খুলে বলে দিলেন, যাতে সবাই জিহাদের জন্য ঠিকমতো প্রসত্মুত হতে পারেন। তিনি তাদেরকে ঈঙ্গিতের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছার কথা জানিয়ে দিলেন।’ এটা ছিল শুধুমাত্র তাবুক যুদ্ধের ঘটনা, অন্য কোন

যুদ্ধে তিনি এটা করেননি। আর আমি এই বিষয়টি এই কারণে উল্লেখ করেছি যাতে মুজাহিদদের কেউ যেন একথা না বলেন যে, 'জিহাদের গন্তব্য না জানালে আমি জিহাদে যাব না'। এবং এই হাদীসে আরো একটি উত্তম বিষয় রয়েছে, সেটা হলো এই যে, তথ্য গোপন করা শুধু শত্রুদের থেকেই নয় বরং দলীয় লোকদের থেকেও হতে পারে। এর উদ্দেশ্য হলো তথ্যকে একটি ক্ষুদ্র পরিসীমায় আবদ্ধ করা যাতে এটি পাচারের সম্ভাবনা কম থাকে; কারণ শত্রুরও গুপ্তচর থাকতে পারে আবার মিত্রও মুখ ফসকে বলে ফেলতে পারে। এ ব্যাপারে একটি কথা প্রচলিত আছে, 'তোমার গোপনীয়তা তোমার রক্তের মাঝে; সুতরাং এটি তুমি কোথাও হিফাজত করবে সে ব্যাপারে খেয়াল রেখো'।

· গোপনীয়তার দৃষ্টান্ত আরো পাওয়া যায় আকাবার বাইয়াতের ঘটনায়, যা গোপনে সম্পাদিত হয়।

· এর দৃষ্টান্ত আরো রয়েছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের ঘটনায়। যা তিনি অত্যন্ত গোপনে করেছিলেন। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

إِلاتَنْصُرُو هُفَقَدْنَصَرَ هُاللَّهُإِذْأَخْرَجَهُالَّذِينَكَفَرُو اثَانِيَاثْنَيْنِإِذْهُمَافِيالْغَارِإِذْيَقُو لُلِصَاحِبِهِلاتَحْزَنْإِنَّاللَّهَمَعَنَا

"তোমরা যদি তাকে সাহায্য না করো (তবে কোন পরোয়া নেই)।

আল্লাহ্ তাকে ঐ সময়ও সাহায্য করেছেন, যখন কাফিররা তাকে (মক্কা থেকে) বের করে দিয়েছিল। যখন তিনি মাত্র দুইজনের একজন ছিলেন, যখন তারা দুজন গুহায় ছিলেন, যখন তিনি তার সাথীকে বলছিলেনঃ ঘাবড়িও না, আল্লাহ্ আমাদের সাথেই আছেন।" [সূরা আত-তাওবাহ ৯ঃ ৪০]

এবং আবু বাকর রদিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমি যখন গুহায় ছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বললাম, 'তাদের কেউ যদি তার পায়ের দিকে তাকায় তাহলে তারা আমাদের দেখে ফেলবে।' সুতরাং তিনি বললেন, 'তুমি কি মনে কর, হে আবু বাকর! সেই দুইজন সম্পর্কে যাদের সাথে তৃতীয় (সঙ্গী) হচ্ছেন আল্লাহ?' এবং সুরাকা যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে অনুসরণ করছিল, তখন তিনি তাকে বলেছিলেন, 'আমাদের (চিহ্ন) গোপন রেখো'।

এবং গোপনীয়তার দৃষ্টান্ত রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের বাহিনীর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কৌশলের মাঝে। তিনি তাকে একটি চিঠি লিখে দিয়েছিলেন এবং তাকে আদেশ করেছিলেন যে, তিনি যেন দুই দিনের যাত্রা শেষ করার আগে এটি না খোলেন, এবং তারপর তিনি যেন এই চিঠির আদেশ অনুযায়ী কাজ করেন।

এবং সামরিক অভিযানের গেপনীয়তার মধ্যেই রয়েছে শত্রুবাহিনীর উপর গুপ্তচরবৃত্তির বিষয়। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শত্রুদের মধ্যে গুপ্তচর পাঠাতেন, যেমন তিনি হুযাইফাকে আল আহযাবের শিবিরে পাঠিয়েছিলেন এবং আয যুবাইরকে একটি অনুসন্ধানী মিশনে একা পাঠিয়েছিলেন এবং সহীহ হাদীস থেকে এমন আরো কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

এর মাঝে আরো নুআইম ইবনে মাসউদের ইসলাম গোপনের ঘটনা, আল আহযাবের দিন যখন তিনি আল আহযাব (কাফিরদের মিত্র বাহিনী) এবং বনু কুরাইযার (মদীনার একটি ইয়াহুদী গোত্র) মাঝে অসন্তোষের বীজ বপন করেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, "নুআইম ইবনে মাসউদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ইসলামে প্রবেশ করেছি এবং আমার গোত্র আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানে না। সুতরাং আপনি আমাকে যা ইচ্ছা তাই হুকুম করতে পারেন।' সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, 'নিশ্চয় তুমি তো মাত্র একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও (অর্থাৎ তুমিতোযুদ্ধচালাতেপারবেনা); সুতরাং তুমি যদি পারো তবে তাদের তাদেরকে ধোঁকা দাও। কারণ নিশ্চয়, যুদ্ধতো হলো চালবাজি।'"

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এটি জায়েজ এবং উপরন্তু তিনি এটাও বলেছেন যে, এ ধরণের সুবিধা আদায়ের জন্য মুশরিকদের অনুকরণ করে তাদের মতো পোষাক পরিচ্ছদ ধারণ করাও আবশ্যক। তিনি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এবং এই ব্যাপারটি স্পষ্ট করে দেয় যে, তাদের অনুকরণের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তা হিজরতের পূর্বে বহাল ছিল, এরপর তা রহিত হয়ে গেছে। কারণ ঐ সময়ে ইয়াহুদীরা নিজেদেরকে মুসলিমদের থেকে নিজেদের কেশবিন্যাস, কাপড় চোপড় বা কোন বেশভূষা বা অন্য কোন কিছুতে আলাদা করতো না।'
'এরপর কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী কাফিরদের থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে এবং বেশভূষায় পৃথক হওযার ব্যাপারে আল্লাহ্র এই হুকুম এটা আবার প্রতিষ্ঠিত হয় উমর ইবনুল খাত্তাব রদিআল্লাহু আনহুর সময়।'

'আর এর কারণ হলো এই যে, দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া অর্থাৎ জিহাদএবংতাদেরউপরঅপমানওজিযিয়ারআইনআরোপকরাছাড়াতাদেরথে কেভিন্নহওয়াযাবেনা।সুতরাংমুসলিমরাপ্রথমেযখনদুর্বলছিলতখন তাদেরকে (বেশভূষায়) ভিন্ন হবার হুকুম দেয়া হয়নি। এরপর যখন দ্বীন পূর্ণতা পায় এবং এটি আধিপত্য লাভ করে এবং প্রাধান্য পায়, তখন এটি প্রয়োগ করা হয়।'

'আর আজকের দিনে এর উদাহরণ হলো, দারুল হারব (যুদ্ধরত দেশ) অথবা যে দেশে যুদ্ধ নেই এমন দারুল কুফরে যদি কোন মুসলিম

বসবাস করে, তাহলে সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকায় তাকে তার বেশভূষায় তাদের (কাফিরদের) থেকে পৃথক হওযার জন্য হুকুম দেয়া হবে না। বরং তার জন্য উচিৎ হবেঅথবা (ক্ষেত্রবিশেষে) তারজন্যআবশ্যকহবেতাদেরসাথেমেলামেশাকরা, যদি এর মধ্যে কোন দ্বীনের কোন কল্যাণ থাকে; যেমন, তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াহ দেয়া, তাদের গোপন বিষয়ের খবরাখবর নিয়ে মুসলিমদের জানানো যাতে মুসলিমরা এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায় এবং এমন আরো অনেক কাজ যা নেক উদ্দেশ্যে করা হয়।'

'তবে ইসলামী রাষ্ট্রে যেখানে হিজরত হয়েছে (দারুল ইসলাম ওয়াল হিজরাত), যেখানে আল্লাহ্ দ্বীনকে আধিপত্য দান করেছেন, এবং কাফিরদের উপর লাঞ্ছনা ও জিযিয়া আরোপ করা হয়েছে, সেখানে তাদের থেকে ভিন্ন হওয়ার হুকুমটি প্রয়োগ করা হবে। আর এই হাদীসের বক্তব্য তখনই পরিষ্কার হয় যখন বিভিন্ন সময় ও পরিস্থিতির কারণে এই হুকুমের অনুসরণের ভিন্নতা স্পষ্ট হয়।'
লেখকের বক্তব্যঃ শারীয়াহ এর দলীল অনুযায়ী এই হলো গোপনীয়তার স্বরূপ। এই আলোচনা থেকেই আপনি তাদের ভ্রান্তি ধরতে পারবেন যারা বলে যে, ইসলাম গোপন মিশন অনুমোদন করে না। এবং এক্ষেত্রে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, ইসলামী দাওয়াহ নিয়ে এগিয়ে চলা এক দল অন্যদের সাথে গোপনীয়তার প্রতিবাদ করে। তাদের এই প্রতিবাদ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের চিন্তা এই

প্রতিবাদীদের অন্তরে কোনই প্রভাব ফেলেনি। অন্যথায় তারা গোপনীয়তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারত, সুতরাং ভেবে দেখুন!

তিনি, (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

وَلَوْأَرَادُواالْخُرُوجَلاعَدُّوالَهُعُدَّةً

"যদি সত্যিই তাদের বের হবার ইচ্ছা থাকতো তাহলে এর জন্য তারা কিছু না কিছু প্রসত্মুতি গ্রহণ করত।" [সূরা আত-তাওবাহ ৯ঃ ৪৬]

'যুদ্ধ হলো ধোঁকা দেয়া' এ আলোচনার এখানেই সমাপ্তি।